হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রঃ

সৈয়দ শামসুল হুদা

facebook/@maktabatuttalamij

শাব্বির

হযরত

নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)

সৈয়দ শামসুল হুদা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

facebook/@maktabatuttalamij

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)
সৈয়দ শামসুল হুদা
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪

ইফা প্রকাশনা : ১২৫৪/৪
ইফা গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭
ISBN : 984-06-0285-3

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৬.
পঞ্চম সংস্করণ (রাজস্ব)

জুন ২০১৩
জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
রজব ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ
মোঃ শামসুজ্জোহা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
খিজির হায়াত খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৪০.০০ টাকা মাত্র

HAZRAT NIZAMUDDIN AOWLIA (R) : [Life-sketch of Hazrat Nizamuddin Aowlia (R)] : Written by Syed Shamsul Huda in Bangla and published by Nurul Islam Manik,, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.db

Price : Tk 40.00 ; US $: 2.50

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

এ উপমহাদেশ ইসলামের আলোকিত সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল যে সকল মহান প্রচারকের দ্বারা তাঁদের মধ্যে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)-এর অবদান অনন্য। এই মহান সাধকের জন্ম ৬৩৪ হিজরীর ২৭ সফর বদায়ুনে। ছোটবেলা থেকেই তাঁর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ছিল অদম্য আগ্রহ। স্বদেশে ইসলাম সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানলাভের পর তাঁর মা জুলায়খা তাঁকে মাত্র ষোল বছর বয়সে দিল্লীতে নিয়ে আসেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। এখানে তিনি জগতখ্যাত আলিম শামসুল মুল্‌ক মাওলানা শামসুদ্দীন (র), সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা কামাল উদ্দীন (র) ও প্রখ্যাত মুর্শিদ ও ওলীয়ে কামেল হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গন্‌জেশকর (র)-এর সান্নিধ্য লাভ করে শরীয়ত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ করেন। মুর্শিদ খাজা ফরীদুদ্দীন গন্‌জেশকর (র)-এর ইচ্ছায় তিনি দিল্লীতেই দীনের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর অনুপম পরহেজগারী ও কামালিয়তের জন্য অল্প দিনের মধ্যেই অগণিত লোকের ভিড় হতে শুরু করে তাঁর খানকা শরীফে। তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এসে মানুষ আলোকিত হয়ে ওঠে।

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)-এর জীবন বহু কারামতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কারামতের কাহিনী আমাদের পুঁথি-সাহিত্য, জারি-সারি, গান-কবিতায় ছড়িয়ে আছে। তবে তাঁকে নিয়ে কিছু অবান্তর কল্প-কাহিনীও প্রচলিত আছে। বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার সৈয়দ শামসুল হুদা বিভিন্ন উৎস ঘেঁটে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)-এর তথ্যনির্ভর জীবনকথা ছোটদের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। জনপ্রিয় এ বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। আশা করছি বইটি আগের মতোই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

facebook/@maktabatuttalamij

উৎসর্গ

প্রিয় বাপজান মরহুম সৈয়দ
নাজির উদ্দীন পীর সাহেব ও
মা মরহুমা সৈয়দা
নাগিমুন্নেসার
মাগফেরাত কামনায়।

facebook/@maktabatuttalamij

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)

প্রথম জীবনে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া একজন ডাকাত ছিলেন বলে যে গল্প লোকমুখে বা জারি প্রভৃতি পুঁথি গানে শোনা যায়, তা কিন্তু সত্য নয়। সে নিযামুদ্দীন অন্য কোন নিযামুদ্দীন হলেও হয়তো হতে পারে। সে নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র) কখনো নয়। তাঁর বাল্যজীবন পাঠ করলেই তাঁর সম্পর্কে ঐসব কথা আজগুবি বলে মনে হবে। হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর আসল নাম নিযামুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী-আল বুখারী। ৬৩৪ হিজরীর ২৭ সফর (১২৩৬ খ্রি.) বাদায়ূনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা শায়খ আহমদ ছিলেন একজন মহান আলিম। শায়খ আহমদের পিতার নাম খাজা আলী। তাঁর শ্বশুর খাজা আরব বুখারার অধিবাসী ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি প্রথমে লাহোরে আসেন এবং পরবর্তীকালে বাদায়ূনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর মা ছিলেন বেগম জুলায়খা। হযরত নিযামুদ্দীন (র) যখন পয়দা হন, তখন তাঁর পিতা বাদায়ূন সরকারের কাযী পদে বহাল ছিলেন। তাই সংসারে কোন আর্থিক অভাব-অনটন ছিল না। কিন্তু যখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর, তখন তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মাতা জুলায়খা বালক নিযামুদ্দীনের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। স্থানীয় মাদ্রাসায় হযরত মওলানা আলাউদ্দীন ওসূলী (র)-এর কাছে তিনি পুত্রের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। বালক নিযামুদ্দীনের বুদ্ধি

facebook/@maktabatuttalamij

দেখে মওলানা আলাউদ্দীন মুগ্ধ হন এবং বিশেষ যত্নসহকারে তাঁকে শিক্ষাদান করতে থাকেন। বিশেষ মেধাবলে ফিকাহ্ শাস্ত্রের কুদুরী কিতাব শেষ করেন বালক নিযামুদ্দীন। এই বিষয়ে দক্ষতা লাভ করায় তিনি সনদ পান। নিযামুদ্দীনের বয়স তখন ষোল বছর। পুত্রের উচ্চ শিক্ষার জন্যে তাঁর আম্মা জুলায়খা বিশেষ ভাবনায় পড়েন। অবশেষে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লী আসেন। তিনি পুত্রের শিক্ষার ভার দেন সে সময়ের একজন খ্যাতনামা ওস্তাদ মওলানা শামসুদ্দীন (র)-এর উপর। তখন দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বলবন। বাদশাহ মওলানা শামসুদ্দীনকে 'শামসুল মুল্‌ক' অর্থাৎ 'দেশের সূর্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। রতনে রতন চেনে। নিযামুদ্দীন (র)-কে দেখামাত্রই শামসুল মুল্‌ক তাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন। অনেক আদর ও যত্নের সঙ্গে তিনি তাঁকে শিক্ষাদান করেন। এরই প্রচেষ্টায় নিযামুদ্দীন (র) আরবি সাহিত্যে সুগভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি মনোনিবেশ করেন।

তৎকালের সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন দিল্লীর মওলানা কামালুদ্দীন (র)। হযরত নিযামুদ্দীন (র) তাঁর কাছে যান এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই বহু হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এত জ্ঞানলাভের পরও হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর মনে হতে লাগল, যেন তিনি কিছুই শেখেননি। প্রকৃত জ্ঞান, সত্যিকার জ্ঞানের জন্যে তাঁর হৃদয় আকুল হয়ে উঠল।

এই সময় প্রখ্যাত ওলী হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গন্‌জেশকর (র)-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নজীবুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্যে অনন্ত পিপাসা জেগে ওঠে তাঁর মনে। তিনি হযরত

facebook/@maktabatuttalamij

খাজা গন্‌জেশকর (র)-এর সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। একদিন ফজরের নামায পড়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পায়ে হেঁটেই রওনা হন তিনি হযরত গন্‌জেশকর (র)-এর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে। হযরত ফরীদুদ্দীন গন্‌জেশকর (র) ইলহাম যোগে নিযামুদ্দীন সম্পর্কে সব জেনেছিলেন। তিনিও ব্যাকুল আগ্রহে নিযামুদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাই নিয়ামুদ্দীন যখন তাঁর দরবারে পৌঁছলেন এবং কদমবুসি করতে গেলেন, তখন সাগ্রহে তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, যেন কতদিনের চেনা।

পীর হযরত ফরীদুদ্দীন গন্‌জেশকর (র)-এর পবিত্র সান্নিধ্যে এসে নিযামুদ্দীন প্রকৃত জ্ঞানের রস পান। হযরত গন্‌জেশকর (র)-এর আয়ু শেষ হয়ে আসছিল। তিনি প্রিয় মুরীদ নিযামুদ্দীন (র)-কে হিন্দুস্থানের বেলায়েত অর্পণ করার কথা ব্যক্ত করেন। মুর্শিদ গন্‌জেশকর (র) মুরীদ নিযামুদ্দীনের মাথায় নিজের টুপি পরিয়ে দেন, দান করেন চপ্পল ও খিরকাহ। অতঃপর তাঁকে ইলমে মারিফত দান করেন। 'মারিফত' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল জ্ঞান পরিচয়। অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ পাকের সত্যিকার পরিচয় মেলে তা-ই ইল্‌মে মারিফত। সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যেমন ওস্তাদের প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষার জন্য তেমনি প্রয়োজন কামেল বুযুর্গ ওলীর। কামেল পীর ইল্‌মে মারিফতের ওস্তাদ। তিনি মুরীদকে মারিফতের বিদ্যা দান করে তার আত্মার উন্নতি সাধন করেন এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগাযোগে সাহায্য করেন। হযরত নিযামুদ্দীন (র) মোট সাত বছর মুর্শিদ খাজা গন্‌জেশকর (র)-এর পবিত্র সান্নিধ্যে কাটান এবং জ্ঞানলাভের চরম শিখরে পৌঁছে যান। অন্যান্য দরবেশের সম্মুখে একদিন তাঁকে হিন্দুস্থানের বেলায়েত

facebook/@maktabatuttalamij

দান করেন পীর মুর্শিদ খাজা গন্‌জেশকর (র)। এরপর মাত্র দু'দিন তিনি পীরের দরবারে থাকেন। বিদায়কালে খাজা গন্‌জেশকর (র) স্নেহের সুরে নিযামুদ্দীন (র)-কে বলেন, "আল্লাহ্ মেহেরবান তাঁর বিশেষ বান্দাদের তিনটি বিষয় দান করে থাকেন – বিদ্যা, জ্ঞান ও আল্লাহ্‌প্রেম। সাধারণ লোক এই তিনটি বিষয় একত্রে পায় না। আল্লাহ তোমাকে সেই নিয়ামতই দান করেছেন।" বিদায়কালে আরো অনেক নসিহত দান করেন তিনি প্রিয় মুরিদকে। অবশেষে নিজ মুখের পবিত্র থুথু তার মুখে লাগিয়ে দিয়ে বলেন, "বাবা ! কুরআন শরীফ হিফ্য কর, ইনশাআল্লাহ্ কোন আয়াত মুখস্থ করার সাথে সাথে তা তোমার অন্তরে চিরতরে গাঁথা হয়ে যাবে।"

হযরত নিযামুদ্দীন (র) পীরকে সালাম করে দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। দিল্লী এসেই শহরের ভিতর আস্তানা তৈয়ার করেন। ফুলের সুবাসের মতো তাঁর আগমন-বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অগুন্‌তি লোকের ভিড় হতে থাকে তাঁর খান্‌কাহ শরীফে। মানুষের সেবা-শুশ্রূষায় দিন শেষ হয়। আসে রাত। তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হন।

প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের আনাগোনা ও ভিড়ের জন্য তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটে। তিনি মুর্শিদের নির্দেশমতো নিয়মিত কুরআন হিফ্য করতে পারেন না। তিনি অধীর হয়ে ওঠেন। একদিন গভীর রাতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মুর্শিদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। দিনের বেলা নানাবিধ হিদায়েতের কাজ ও রাতের বেলা জঙ্গলে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশ পান। তখন থেকে তিনি ইশার নামাযান্তে গভীর বনে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে রাত কাটাতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠের

facebook/@maktabatuttalamij

কুরআন পাঠ শুনে বনের পশুরা আহার-বিহার, হিংস্রতা ভুলে তাঁর পাশে জমায়েত হতো। গভীর রাতে জঙ্গলে ও দিবাভাগে লোকালয়ে—এভাবে সময় কাটতে থাকে তাঁর। অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ কুরআন পাক মুখস্থ হয়ে যায়। রাত্রিকালীন গভীর জঙ্গলের নির্জন পরিবেশ ইবাদতের জন্য তুলনাহীন। তাই সুদীর্ঘ দশ বছর জঙ্গলেই তিনি রাত কাটান। এই সময় স্বপ্নযোগে গন্জেশকর (র) তাঁকে দিল্লী ছেড়ে গিয়াসপুরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। গিয়াসপুরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে রাখেন তিনি। কেবল ইবাদত আর ইবাদত। দিন-রাত ইবাদতের মধ্যে ডুবে থাকেন। পীরের নির্দেশে সারাটা বছর রোযা রাখেন তখন থেকে। ইফতারের জন্য কখনও সামান্য আহার জুটত, কখনো জুটত না। এ জন্য তাঁর ভ্রূক্ষেপ মাত্র ছিল না। একাধারে কয়েকদিন অনাহারে থাকার পর অলৌকিকভাবে কখনো কখনো আহার জুটে যেতো। তিনি বুঝতে পারতেন এসব পীর-মুর্শিদের কারামত ছাড়া আর কিছুই নয়। নিযামুদ্দীন (র) 'আল্লাহ্র মেহমান' অর্থাৎ অনাহারে থেকে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকতেই সর্বাধিক ভালোবাসতেন। অনাহার হযরত নিযামুদ্দীন (র) ও তাঁর আস্তানার দরবেশদের ছিল নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এ অবস্থা একদিন চিরদিনের মতোই মোচন হয়ে যায়। চারদিন সম্পূর্ণ উপবাসের পর কোন ভক্ত-শিষ্যের দেয়া আটা খামির করে জ্বলন্ত উনুনের ওপর এক পাত্রে রেখেছেন, এমন সময় দরবেশ বেশে এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে কিছু খাবার চাইলে তিনি সেই আটার খামির তাঁকে দিয়ে দেন। দরবেশবেশী অপরিচিত ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ঐ উত্তপ্ত সমস্ত খামির আটা একসঙ্গে খেয়ে ফেলে পাত্রটি ছুঁড়ে মারেন এবং হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর কোনদিন খাবারের কোন অসুবিধা হবে না

facebook/@maktabatuttalamij

বলে অদৃশ্য হয়ে যান। হযরত নিযামুদ্দীন (র) দরবেশবেশী ওলীকে অবশ্যই চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু কোনদিন কারো কাছে তাঁর পরিচয় ব্যক্ত করেননি। এই ঘটনার পর থেকেই তাঁর কাছে এত নযর-নিয়াজ আসতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত এক বিশাল লঙ্গরখানা খুলতে হয় তাঁকে। দলে দলে মানুষ ভিড় জমাতে থাকে তাঁর চারপাশে। যতই লোক হোক না কেন, এক মুহূর্তের জন্যও লঙ্গরখানায় রসদের টান পড়ে না। লঙ্গরখানার তরকারি রান্না করতেই প্রতিদিন লাগতো কয়েক মণ লবণ। এতেই অনুমান করা যায় কত অসংখ্য লোকের ভিড় হতো তাঁর আস্তানায়। সারা বছর রোযা রাখতেন তিনি। ইফতারের সময় কোনদিন একটা খেজুর বা একটু রুটি মুখে দিতেন মাত্র।

সকলের নযর-নিয়াজ তিনি গ্রহণ করতেন না। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তবে কেউ অসন্তুষ্ট মনেও ফিরে যেত না। এমনি ছিল তাঁর মিষ্টি-মধুর ব্যবহার।

একটি লোক এক থলে টাকা নযর দিতে আসে তাঁকে। তিনি তা নিতে না চাওয়ায় লোকটি মনে বড়ই আঘাত পায়। তখন তিনি তার থলে থেকে একটি মাত্র টাকা তুলে নেন এবং বাদ-বাকি টাকা বাড়ি নিয়ে গিয়ে পরিশোধ করতে বলেন। হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর কথামতো লোকটি বাড়ি আসে এবং সত্য সত্যই এক পাওনাদারকে তার অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখে। তৎক্ষণাৎ সে ঐ টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে এবং পরের দিনই তাঁর দরবারে গিয়ে মুরিদ হয়ে যায়।

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র) সত্যিকার অর্থে যোহদ। পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি এতটুকু আসক্তি-আকর্ষণ ছিল না তাঁর। 'আল্লাহ্‌র মেহমান' হওয়াতেই ছিল তাঁর সমগ্র সুখ, সমগ্র শান্তি।

facebook/@maktabatuttalamij

আমীর খসরু বিশ্বের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং সঙ্গীতবিদ। পর পর কয়েকজন সম্রাটের সভা তিনি অলংকৃত করেছিলেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে। কিন্তু তিনি যে অনেক বড় সাধক ওলী ছিলেন সে কথা অনেকের জানা নেই। এই আমীর খসরু ছিলেন হযরত খাজা নিযামুদ্দীন (র)-এর অন্যতম প্রিয় মুরিদ।

এই কবি আমীর খসরুর হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর মুরীদ হওয়ার ঘটনাটি ভারি সুন্দর।

কবি আমীর খসরুর আব্বা আমীর সাইফুদ্দীন মাহ্মুদ অতীব আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিয়মিত হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর আস্তানায় যেতেন এবং তাঁর প্রেমময় নসিহত শুনে তৃপ্ত ও মুগ্ধ হতেন। তিনি চাইলেন তাঁর প্রতিভাবান পুত্র খসরু হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর শিষ্যত্ব লাভ করুক।

কে জানে কি ভেবে কবি চাইলেন হযরত নিযামুদ্দীন (র)-কে একটু যাচাই করতে। তিনি তার আব্বাকে তাঁর আস্তানার অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বাইরে বসে রইলেন।

কবিতার কয়েকটি চরণ তৈরি করে মনে মনে আওড়াতে থাকলেন উত্তরের প্রতীক্ষায় :

জানি তোমার অসীম কারামত
অট্টালিকার ছাদে বসা ঐ যে কবুতর
এক লহমায় পারো তারে
বাজ পাখিতে করতে রূপান্তর।
দীনহীন এই বসে আছি
দ্বারপ্রান্তে আকুল তিয়াসায়

facebook/@maktabatuttalamij

ডাকবে, না ফিরিয়ে দেবে
জানতে এ মন চায়।

কবি ভাবলেন, কামেল বুযুর্গ হলে নিশ্চয়ই অজানা থাকবে না তাঁর কাছে মনের এই গোপন কথা। বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না কবির। সহসা এক দরবেশ এসে তাকে নাম ধরে ডাকলেন এবং হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর উত্তর শুনিয়ে দিলেন : "সত্যানুসন্ধানী হ'লে ভেতরে এসো এবং আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে রহস্য সন্ধানে নিমগ্ন হও। অন্যথায় অর্বাচীন হলে ফিরে যাও।"

পাগলের মতো ছুটে গিয়ে হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন আমীর খসরু। মৃদু হেসে সস্নেহে বুকে তুলে নিলেন তাঁকে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন (র)।

কবি আমীর খসরু স্বীয় পীর হযরত নিযামুদ্দীন (র)-কে যে কেমন ভক্তি করতেন তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। একবার ঘরে কিছু না থাকায় হযরত নিযামুদ্দীন (র) এক ভিখারীকে তাঁর পায়ের জুতা দান করেছিলেন। কবি আমীর খসরু বাদশাহ্‌র সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে সেই ফকিরের সঙ্গে তার দেখা হয়। ফকিরের শরীর থেকে হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর গন্ধ পান কবি। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, তার পোটলার মধ্যে হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর সেই জুতা বাঁধা রয়েছে। অনেক টাকার বিনিময়ে তিনি ফকিরের কাছ থেকে পীরের জুতা ফিরিয়ে নেন এবং মাথায় বয়ে নিয়ে গিয়ে তা তাঁর কদম মুবারকে পরিয়ে দেন।

মুরিদ আমীর খসরুর প্রতি পীর নিযামুদ্দীন (র)-এর যে স্নেহ তারও নজির মেলা ভার। হযরত নিযামুদ্দীন (র) আমীর খসরুর ভক্তিতে এমনি

facebook/@maktabatuttalamij

খুশি ছিলেন যে, শরিয়তের বিধান থাকলে একই কবরে দু'জনের দাফনের ওসিয়ত করে যেতেন বলেও তিনি ব্যক্ত করেন। আমীর খসরুকে সাথে না নিয়ে বেহেশতের দুয়ারে পা রাখবেন না—এমন কথাও বলে যান তিনি।

হযরত নিযামুদ্দীন (র) রাজ সান্নিধ্য অপছন্দ করতেন। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জালালুদ্দীন খিলজী, আলাউদ্দীন খিলজী কাউকেই তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বা তাঁর আস্তানায় যেতে অনুমতি দেননি। তবে তিনি তাঁদেরকে দোয়া করেছেন। তাঁদের জন্য নসিহত রেখেছেন। বিশেষ করে আলাউদ্দীন খিলজী হযরত নিযামুদ্দীন (র)-কে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। অনেক বিপদ থেকে তাই তিনি রক্ষা পান। অনেক দেশ বিজয় করা সহজ হয় তাঁর পক্ষে।

দিল্লী নগরী প্রায় অরক্ষিত রেখে একবার সম্রাট আলাউদ্দীন এক যুদ্ধে গমন করেন। এমন সময় দুর্ধর্ষ তারঘী দিল্লী অবরোধ করে বসে। হযরত নিযামুদ্দীন (র) এ বিষয়ে অবগত হয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন। সেই দোয়ার বলেই মুষ্টিমেয় নগররক্ষীদের হাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে তারঘী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দিল্লী নগরী অভাবিতভাবে হয় রাহুমুক্ত। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী হযরত নিযামুদ্দীন (র)-কে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। এরই ফলস্বরূপ তাঁর রাজ্যে পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র কুতুবুদ্দীন মুবারক সিংহাসনে বসেন। এই কুতুবুদ্দীন হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর সঙ্গে বেয়াদবী করে বসেন। আলাউদ্দীন খিলজীর নিহত পুত্রদ্বয় তাঁর মুরীদ ছিলেন। তাঁরা হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর নসিহত মোতাবেক দেশ শাসন করতেন। কুতুবুদ্দীন শাহী ফরমান জারি করে হযরত নিযামুদ্দীন

facebook/@maktabatuttalamij

(র)-কে রাজ-দরবারে হাযির হতে বলেন। হযরত নিযামুদ্দীন (র) সেই ফরমান পাঠ করে ক্ষুব্ধ হন। এর কয়েকদিন পরেই কুতুবুদ্দীন নিহত হন ও খসরু খান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। আল্লাহ্ প্রেমিকের সঙ্গে অসদাচরণ করলে তার পরিণাম এমনি হয়ে থাকে। দুনিয়ার বাদশাহীর অহংকার ক্ষণভঙ্গুর। আল্লাহ্‌র ওলীর সিংহাসন আল্লাহ্‌র আরশের নিচে। তাঁর ক্ষমতা অসীম। হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র) যে নিয়ম বা তরিকায় ইলমে মারিফত শিক্ষা দিতেন তা 'নিযামিয়া তরিকা' নামেই খ্যাত। এই তরিকায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে শায়খ নাসিরুদ্দিন দেহলবী (র), শায়খ হেশামুদ্দীন মুসতাহ্, শায়খ শারফুদ্দীন বুআলী কলন্দর ও শায়খ কুতুবুদ্দীন ওমনায়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একাধিক সম্রাটের সভাকবি হযরত আমীর খসরু ছিলেন হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মুরিদ। কবির আল্লাহ্‌প্রেমের উপর রচিত কবিতা শোনার জন্য তিনি সর্বদা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। কবি আস্তানায় এলেই অত্যন্ত আদব সহকারে তিনি তাঁকে নিজের পাশে বসাতেন। কবি কবিতা পাঠ করতেন আর অবিরল ধারায় হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর আকুল দুটি চোখ বেয়ে ঝরত অশ্রু। সময় সময় তিনি প্রেমাবেগে অচেতন হয়ে পড়তেন। অনেক্ষণ পর তাঁর চেতনা যখন ফিরে আসত, তখন তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ বলে মনে হতো।

একদিন একটি কবিতা পাঠের শেষে হযরত নিযামুদ্দীন (র) বলেন যে, তিনি কবিতা শুন্‌তে শুন্‌তে সপ্তম আসমানে পৌঁছেছিলেন। সেখানে ফেরেশ্‌তারা ভিড় করে আমীর খসরুর কবিতার তারিফ করছিল। এই

facebook/@maktabatuttalamij

কথা শুনে কবি তাঁর দোয়া প্রার্থনা করেন যেন তাঁর কবিতা আরো জনপ্রিয় হয় ও মানুষের হেদায়েতে সহায় হয়। তিনি কবিকে যেদিন দোয়া করেন, সেদিন থেকে তাঁর কবি-প্রতিভা আরো উন্নত, অতুলনীয় হয়ে ওঠে। তখন থেকে কবির রচিত 'সামা' কবিতা শুনে মুহূর্তের মধ্যে সবাই আল্লাহ্প্রেমে মশগুল ও মাতোয়ারা হয়ে যায়। হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর সমগ্র জীবনটাই ছিল অপূর্ব কারামতপূর্ণ। দিল্লীর সিংহাসনে তখন গিয়াসউদ্দীন তুঘলক। ওলী-আল্লাহ্গণের জনপ্রিয়তা তাঁর বড়ই মর্মপীড়ার সৃষ্টি করতো। হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে। কোন এক ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক হযরত নিযামুদ্দীন (র)-কে পাঁচ লাখ টাকা দান করেন। সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি উদাসীন আউলিয়া সে টাকা গরীব-মিসকিনের মধ্যে বিতরণ করে দেন। গিয়াসউদ্দীন হযরত নিযামুদ্দীনকে সে টাকা ফেরত দিতে বললে হযরত নিযামুদ্দীন তা ফেরত দেন না। এই রাগে সুলতান হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়াকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেন।

জনশ্রুতি আছে যে, কাঠের গড়া এক ঘরের থামের পতনে গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হয়। আর দরবেশের বদ্দোয়াটি ছিল এই মৃত্যুর কারণ। হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর পীর হযরত খাজা গন্জেশকর (র) সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁর আসল নাম ফরিদুদ্দীন মাস্‌উদ। পিতা জামালুদ্দীন সুলায়মান লাহোরের কাযী ছিলেন। ফরিদুদ্দীনের শৈশবকালেই তিনি ইন্তিকাল করেন। শিশু ফরিদুদ্দীনের সমস্ত দায়িত্ব পড়ে মায়ের উপর। মা ছিলেন বিদুষী, সৎ ও ধর্মপরায়ণা। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পুত্রকে নামাযে অভ্যস্ত করেন। পুত্রকে নামাযী

facebook/@maktabatuttalamij

যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পথে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। কোথায় যাবেন, সামনে নযরে পড়লো এক ছোট্ট কুটির। তিনি আশ্রয় চাওয়াতে কুটিরের মালিক বলেন, স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। তিনদিন প্রসব বেদনায় অস্থির। বারান্দাও নাই, ঘরের ভেতর কোথায় জায়গা দেই ? গন্জেশকর (র) বলেন, "আমাকে আশ্রয় দিলে তোমার স্ত্রীর সকল কষ্ট দূর হবে।" এই কথায় কুটিরের মালিক তাকে ভেতরে জায়গা করে দিলো। এরপর তিনি বললেন, তার গাধাটি বাইরে ভিজবে, কষ্ট পাবে, তা চলবে না। তাকেও ঘরের ভেতর স্থান করে দিতে হবে। কুটিরের মালিক বলল, "আপনারই জায়গা হয় না, গাধাটিকে কোথায় জায়গা দেই ?" তিনি বলেন, "মিছেমিছি তুমি তোমার স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছ। এতক্ষণে সে সন্তান প্রসব করে কষ্টমুক্ত হয়ে যেত।" অগত্যা লোকটি সেখানে গাধারও জায়গা করে দিলো। গন্জেশকর (র) একটা কাঠের টুকরোর উপর লিখে দেন, 'আমার জায়গা হয়েছে' আমার গাধারও জায়গা মিলেছে। এখন হে, তোমার ইচ্ছা হয় প্রসব কর, না হয় না কর।" মামুলী কথার মতো। তাঁর নির্দেশমতো স্ত্রীর গর্ভে ঐ কাষ্ঠখণ্ড স্পর্শ করা মাত্র সন্তান প্রসব হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা এক লহমায় হলো দূর।

আর একটি ঘটনা। একদিন একটি লোক গন্জেশকর (র)-এর আস্তানায় এসে বলে যে, একদল ডাকাত জোর করে তার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে। মহা বিপদ! গন্জেশকর (র) তাকে নিছক সান্ত্বনার স্বরে বলেন, যাও ঘরে ফিরে খাওয়া-দাওয়া কর। ছেলেমেয়েদের বোঝাও। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমার স্ত্রী ফিরে আসতে পারে। লোকটি এই সান্ত্বনার কথা শুনে চলে গেলো। এর মাত্র একদিন কি দু'দিন পরের ঘটনা : একদল রাজপুলিশ সুবেশী এক ব্যক্তিকে বন্দী করে রাজদরবারে নিয়ে যাচ্ছিল।

facebook/@maktabatuttalamij

বানানোর জন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। নামায পড়লে চিনি পাওয়া যায় এই লোভ দেখিয়ে তিনি জায়নামাযের নিচে চিনির পুরিয়া রেখে দিতেন। ছেলে নিয়মিত নামায পড়ে ও চিনি পায়। একদিন মা চিনি রাখতে ভুলে যান। এতে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন মা। অবশেষে ছেলের মুখে জানতে পারেন যে, সে নামাযও পড়েছে এবং যথানিয়মে চিনিও পেয়েছে। মা বুঝতে পারেন আল্লাহ্‌র বিশেষ রহম রয়েছে তার ছেলের উপর। 'শকর' শব্দের অর্থ চিনি। এই ঘটনার জন্যই শৈশবের সেই ফরিদুদ্দীন পরবর্তীকালে গন্‌জেশকর নামে সুবিখ্যাত হন। গন্‌জ শব্দটির অর্থ গুদাম। হযরত গন্‌জেশকর (র)-এর পীর ছিলেন সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র)-এর মুরিদ সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)। আপন পীরের প্রতি অবিচল ভক্তির ওপরই নির্ভর করে কামালিয়াত লাভের সৌভাগ্য। এক সময়ে তাঁর পীর হযরত বখতিয়ার কাকী (র)-এর আস্তানায় তদীয় পীর হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) তশরীফ আনেন। হযরত বখতিয়ার কাকী (র) স্বীয় মুরীদ গন্‌জেশকরকে বলেন দাদা পীর সাহেবকে কদমবুসি করতে। বারবার হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র)-এর পরিবর্তে তিনি স্বীয় পীর হযরত কাকী (র)-কেই কদমবুসি করেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) তখন বলেন যে, "গন্‌জেশকর তোমার মাধ্যমেই তাওহিদের ফয়েজ লাভ করেছে। তাই তোমার কদমই তাঁর চোখে পড়ছে। আমার প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন নয়। বরং এতে করে তাঁর প্রকৃত সত্যই প্রকাশ পাচ্ছে।" হযরত খাজা ফরিদুদ্দীন মাসূউদ গন্‌জেশকর (র) মুখে যা উচ্চারণ করতেন তাই কারামতে পরিণত হত। একদিন তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে কোথাও

facebook/@maktabatuttalamij

বন্দী লোকটি খাজা সাহেবের আস্তানার কাছে আসতেই পুলিশদেরকে অনুরোধ করে তাঁর দোয়া প্রার্থনা করে। তিনি তার মুখের দিকে চেয়েই বললেন, যাও কোন ভয় নাই, তবে মুক্তি পাওয়ার পরে একটি বাঁদী ক্রয় করে আমার কাছে আসবে। রাজদরবারে হাযির হওয়া মাত্র সত্য সত্যই লোকটি মুক্তি পায়। কাযী তার মুখের দিকে একবার নযর দিয়েই বলেন, যাও তুমি নির্দোষ, তুমি মুক্ত। লোকটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর বাজার থেকে একটি বাঁদী ক্রয় করে আনে এবং গন্জেশকর (র)-এর কথামতো তাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে আসে। পূর্বের সেই ব্যক্তি, যার স্ত্রীকে ডাকাতরা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, সে খাজার আস্তানায় আসলেই তার কাছে এই বাঁদীকে অর্পণ করা হয়। লোকটি অবাক হয়ে যায়! এ যে তারই স্ত্রী। ডাকাতরা তাকেই ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। আল্লাহ্‌র ওলীদের কাছে অলৌকিক কিছুই নয়, তাঁদের চোখ সবকিছু দেখে। সবকিছুর সমাধান এমনিভাবেই করেন তাঁরা।

সত্যিকার অর্থে মানুষ আল্লাহ্ পাকের প্রিয়পাত্র হলে আল্লাহ্ তাঁর অনেক ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা দেন। যেমন কিনা বেহেশ্‌তে বেহেশ্‌তবাসী মানুষ কোন ফল খেতে চাওয়ার ইচ্ছামাত্র তার মুখের কাছে এসে হাযির হবে। আসলে আল্লাহ্ পাক তাকে আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান করে তোলেন, তাই এমন সম্ভব হয়। ওলী-আল্লাহ্‌দের কারামতে বিস্মিত হবার কিছুই নাই। আল্লাহ্ সব পারেন। সবই তাঁর এখতিয়ারভুক্ত। তাঁর প্রিয় পাত্রদের দ্বারা তাই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করিয়ে থাকেন। প্রিয় পাত্রদের প্রতি তাঁর এ এক অসীম ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

facebook/@maktabatuttalamij

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র) ছিলেন ওলী-শ্রেষ্ঠ হযরত খাজা ফরিদুদ্দীন গন্‌জেশকর (র)-এর সর্বাধিক প্রিয় খলিফা। ইন্তিকালের আগে গন্‌জেশকর (র) ওসীয়ত করেন, তাঁর লাঠি ও খিরকা যেন হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)-কে প্রদান করা হয়। তাঁর জানাযায় নামায পড়ানোর জন্যও তিনি হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর নাম উল্লেখ করেন এবং হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর আস্তানাতেই তাঁকে দাফন করার ওসীয়ত করে যান।

স্বীয় মুর্শিদ হযরত খাজা গন্‌জেশকর (র)-এর উপদেশাবলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন হযরত নিযামুদ্দীন (র)। তাঁর দরবেশী জীবনের অমূল্য পাথেয় ছিলো এই উপদেশাবলি :

১. মারিফত শাস্ত্রের বড় কথা আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর রহমতের অন্তহীন আশা।
২. নিজ নফসের চিকিৎসা নিজেকেই করতে হবে। পীর সাহায্যকারী মাত্র।
৩. নিজেকে জাহির না করাই প্রকৃত দরবেশী।
৪. পরের দোষ না দেখে নিজের দোষ বের করা ও সংশোধন করাই দরবেশী লাভের প্রথম শর্ত।
৫. যেসব কথা শরীয়ত সমর্থিত নয় তা থেকে নিজ জিহ্‌বাকে সব সময় সংযত রাখা।
৬. যেসব কথা শোনার যোগ্য নয় তা না শোনা।
৭. যেসব জায়গায়, অনুষ্ঠানে শরীয়ত যাওয়ার অনুমোদন দান করে না, সে সব স্থানে না যাওয়াই উত্তম।

facebook/@maktabatuttalamij

৮. দুনিয়ার মানুষ নয়, আল্লাহ্‌র সঙ্গেই রাখতে হবে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক।

৯. দুনিয়ার মোহ যার যত বেশি, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সে তত দূরে।

১০. ফকিরের সবচাইতে বড় শত্রু ধনী লোকের সংস্রব।

১১. মৃত্যুকে স্মরণ করলে অন্তর হয় নরম ও নির্মল।

১২. ইলমের চাইতে বড় সম্পদ আর নাই।

১৩. মারিফত হাসিলের দু'টি শর্ত—ইলম ও ইশ্‌ক।

১৪. খাঁটি প্রেমিকের অন্তর সব সময় বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকে। বিপদাপদই তার আত্মার খোরাক-স্বরূপ। আল্লাহ্‌ বিপদাপদ দিয়েই তাঁর খাঁটি বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকেন।

১৫. ফকির, দরবেশগণ সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকেন। তাঁরা যখন জামা গায়ে দেন তখন মনে করেন সেটা কাফনের কাপড়। যখন গোসল করেন, তখন ভাবেন সেটা মরণের গোসল। তাঁরা কখনো অলসভাবে বসে থাকেন না। মরণ পথের সম্বল, পাথেয় তাঁরা জীবদ্দশাতেই যোগাড় করে থাকেন।

করুণাময় আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের জন্য মৃত্যু কোন ভয়ের ব্যাপার নয়। মৃত্যুরূপ আড়ালের ওপারেই তো মহান প্রেমাস্পদ সকল সাধনার পরম ধন। চিরঅদৃশ্য দেবেন দেখা, দেবেন দিদার।

মৃত্যুর অন্তিম আহ্বানে তাই স্বভাবতই পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন পরম তাপস, পরম প্রেমিক হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)।

facebook/@maktabatuttalamij

অবশেষে ৭২৫ হিজরীর এক মহান দিনে তিনি সমগ্র ভক্তকে অকূল শোক সাগরে ভাসিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি সকলকে হা-হুতাশ করতে নিষেধ করেন। দুনিয়ার কেউই চিরদিন থাকার জন্যে আসেনি। আল্লাহ্‌র পথে থেকে যে আমরণ নেক আমলের সংখ্যা বাড়াবে সে-ই ভাগ্যবান। তারই সাথে তাঁর দেখা হবে, তাঁদের নিয়ে একসাথে মিলিত হবেন আল্লাহ্‌র দরবারে। যে কান্নায় আল্লাহ্‌র প্রেম ও ভয় নেই, সে কান্না বৃথা। কোন লাভ নেই তাতে। আল্লাহ্‌র ভয়ে যে চোখ পানিতে ভরে সে চোখ দোযখে কোনদিন পুড়বে না।

হযরত নিযামুদ্দীন (র) আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনাশায় এমনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে, কেউ ওষুধ সেবন করাতে এলে বিরক্ত হয়ে উঠতেন। বলতেন, তোমরা আমাকে কেন অনর্থক কষ্ট দিচ্ছ? হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর ইন্তিকালে সারা দিল্লী নগরে যেন কান্নার বান ডেকে গেল। সমগ্র নগরী যেন শোকে মুহ্যমান। কত সম্রাট, কত মহাপুরুষ গত হয়েছেন দিল্লীর বুক থেকে, কিন্তু এত কান্না কেউ কোনদিন কাঁদেনি।

দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর অন্যতম বিশেষ ভক্ত ছিলেন। হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র সমস্ত রাজকর্ম ফেলে ছুটে এলেন তাঁর শেষ শয্যার পাশে। পবিত্র চেহারা মোবারক থেকে চাদর সরানো হলো। সম্রাট শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

মৃত্যুর পূর্বে হযরত নিযামুদ্দীন (র) অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, যেনো পার্শ্ববর্তী পুকুরের মধ্যে তাঁকে দাফন করা হয়। সম্রাটের আদেশে তখনই সেই পুকুর ভরাট করা হয় এবং হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর

facebook/@maktabatuttalamij

কবর মোবারক প্রস্তুত করা হয়। সম্রাট নিজে কবরে নামেন এবং হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর পবিত্র দেহ কবরে রাখেন। আল্লাহ্‌র ওলীগণ স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুবরণ করলেও তাঁরা চির অমর।

ওলী-আল্লাহ্‌দের কবরের আশেপাশের কবরবাসীদের গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেন আল্লাহ্। লাঘব করে দেন আযাব। হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর কবরের পাশে সমাহিত হবার জন্য তাই গণ্যমান্য অনেকেই ছিলেন লালায়িত। মোগল সম্রাট বাবরের ছেলে হুমায়ুন, সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম, সম্রাট বাহাদুর শাহের ভাই মির্জা জাহাঙ্গীর প্রমুখ হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর কবরের পাশে নিজেদের কবর তৈরি করার জন্য অসীয়ত করেছিলেন। এ ছাড়াও অসংখ্য আলিম ও দরবেশের কবরও রয়েছে তাঁর মাযারের আশেপাশে। তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে কয়েক মাইলব্যাপী রয়েছে এই কবরগাহ্।

হযরত নিযামুদ্দীন (র)-এর মাযারের বরকত সর্বত্র বিদিত। বিভিন্ন মনস্কামনা পূরণের আশায় তাই তাঁর মাযারে অফুরন্ত মানুষের ভিড় সব সময়ই দেখা যায়।

ইফা—২০১২-২০১৩—প্র/৪১৯৩(রা)—৫২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

facebook/@maktabatuttalamij